মৌলভী তমিজউদ্দিন খান এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা

আবদুল মান্নান

পাকিস্তানের এক সময়ের সামরিক বাহিনীপ্রধান, সামরিক আইন প্রশাসক এবং পরবর্তীকালে অত্যন্ত ক্ষমতাধর রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মোশারফ, যিনি প্রায় সাত বছর ধরে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় অত্যন্ত কঠিন হাতে শাসন করেছেন– এখন অনেকটা ঘরছাড়া, সাময়িক ভাবে বিলাতে অবস্থান করছেন এবং একটি স্থায়ী বসবাসের জায়গা খুঁজছেন। সৌদি আরব, যেখানে ইসলামের দুটি পবিত্রতম স্থাপনা অবস্থিত তারা নিজ দেশ থেকে বিতারিত এককালের এই লৌহমানবকে আশ্রয় দিতে সম্মত হয়েছে। সৌদি আরব নিয়মিত ভাবে অন্যান্য দেশের সাধারণ গরিব, খেটে খাওয়া মানুষদের সে দেশ থেকে উৎখাত করে বিতারিত করলেও দুনিয়ার সকল বিতর্কিত মুসলমান সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে আশ্রয় দিতে কখনও কুণ্ঠিত হয় না। কোন এক সময় হয়ত দেখা যাবে ইসলামের এই পবিত্র স্থানটি সকল বিতর্কিত ব্যক্তিদের অভয়াশ্রমে পরিণত হবে।

সম্প্রতি পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত পারভেজ মোশারফের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে ২০০৭ সালের ৩ নবেম্বর জারিকৃত জরুরী অবস্থাকে আসাংবিধানিক ও অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। আদালত শুধু এখানেই থেমে থাকেনি তারা জরুরী অবস্থা জারির পর যে ৬০ জন বিচারপতি সর্বোচ্চ আদালত হতে নিম্ন আদালত পর্যন্ত পারভেজ মোশারফের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বিচারক হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নিয়োগকেও অবৈধ ঘোষণা করেছে। কারণ পারভেজ মোশারফ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে সর্বোচ্চ আদালতসহ বিভিন্ন আদালতের অসংখ্য বিচারপতিকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মদ চৌধুরীকে বরখাস্ত করে তার স্থলে বিচারপতি আবদুল হামিদ ডোগারকে প্রদান বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। গত ৩১ জুলাই ঘোষিত রায়ে চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট সুপ্রীমকোর্টের বেঞ্চের প্রধান বিচারপতি ইফতেখার মুহাম্মদ চৌধুরী জনাকীর্ণ আদালতে বলেছেন, যেহেতু জরুরী অবস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ডোগারের নিয়োগই অবৈধ ছিল সেহেতু তার কাছে শপথ নেয়া সকল বিচারপতির নিয়োগও অবৈধ। এই সাথে আদালত সেই সময় জারিকৃত ৩৭টি অধ্যাদেশ বেআইনী ও অসাংবিধানিক বলে রায় দিয়েছে। রায়ের আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশারফের আছে তার স্বপক্ষে কোন বক্তব্য আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি নিরুত্তর থাকেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের অধীনে (Independence of India Act, 1947) ইংল্যান্ডের রাজা পাকিস্তানে একটি গণপরিষদ গঠন করার আদেশ জারি করেন এবং সেই মতে পাকিস্তানের উভয় অংশের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে পাকিস্তানের গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের প্রথম স্পীকারের দয়িত্ব পালন করেন পাকিস্তানের প্রথম গবর্নর জেনারেল এবং দেশটির প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রায় এক বছরের মাথায় ১৯৪৮ সালে জিন্নাহ্র মুত্যু হয়। দ্বিতীয় স্পীকার হিসাবে মনোনীত হন পূর্ব বাংলার মৌলভী তমিজউদ্দিন খান (জন্ম ফরিদপুর)। তমিজউদ্দিন খান ছিলেন একজন অত্যন্ত সাদাসিধা অমায়িক স্বল্পভাষী ভদ্রলোক। তাঁর নেতৃত্বেই গণপরিষদ পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের কাজ এগিয়ে নিতে থাকে। ভাষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, সামাজিক ব্যবস্থা, পাঁচটি প্রদেশের নিজস্ব প্রত্যাশা সব কিছু মিলিয়ে এ রকম একটি বহুধাবিভক্ত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন খুব সহজ ছিল না। যখন দেশটির গণপরিষদ সংবিধান প্রণয়নের এই কঠিন কাজটি করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর এক প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে দেশটির গবর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ গণপরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে– এই অজুহাত তুলে দেশে জরুরী আইন জারি করেন। গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নিজের পছন্দসই তাঁবেদারদের নিয়ে এক নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খান বিষয়টি সহজে মেনে না নিয়ে সিন্ধু প্রদেশের হাইকোর্টে গবর্নর জেনারেলের এই অগণতান্ত্রিক আদেশের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় দীর্ঘ শুনানির পর ইংরেজ বংশোদ্ভুত প্রধান বিচারপতি কনস্টেনটিন (Constantine) মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের পক্ষে রায় দেন। রায় ছিল সিন্ধু হাইকোর্টের সর্বসম্মত রায়। আদালত তার রায়ে মন্তব্য করে, যে আইনের অধীনে গণপরিষদের গঠন ও কর্মপরিচালনা সেই ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীন আইনে গবর্নর জেনারেলকে গণপরিষদ বিলুপ্তির কোন ক্ষমতা প্রদান করেনি। এই মামলায় মৌলভী তমিজউদ্দিন খানকে আইনী সহায়তা প্রদান করেন সেই সময়কার পাকিস্তানের জাঁদরেল আইনবিদ এসএস পীরজাদা এবং তাঁকে সহায়তা করতে লন্ডন থেকে আনা হয় ব্যারিস্টার ডিএম প্রিটকে। গবর্ণর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের পক্ষে ছিলেন স্যার আইবর জেনিংস, যিনি মূলত পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চ বেতনভুক কর্মচারী ছিলেন। কারণ তিনি গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নে সহায়তা করছিলেন।

সুপ্রীমকোর্টের মামলায় সরকার পক্ষে আইনী সহায়তা দিতে বিলেত থেকে উড়ে আসেন আরও জাঁদরেল আইন বিশেষজ্ঞ স্যার এডওয়ার্ড ডিপলক। স্যার আইভর জেনিংস তো আছেনই। মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের পক্ষে নামী দামী কোন আইনবিদ নিয়োগ দেয়া সম্ভব ছিল না। ডিএম প্রিট তার ফি বাড়িয়ে দিয়েছেন, যা মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের সাধ্যের বাইরে ছিল। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন আইআই চুন্দ্রীগড় (পরে তিনি স্বল্প সময়ের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন)। পাকিস্তানের আইনী লড়াইয়ের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত পাকিস্তান (গোলাম মুহাম্মদ) বনাম মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের মামলা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন মোহাম্মদ মুনির। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী এবং আইন শাস্ত্রে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্য ইতিহাস তাঁর পক্ষে ছিল না। বলা হয় তিনি গবর্নর জেনারেলের সাথে গোপন আঁতাত করে সিন্ধু হাইকোর্টের রায়টা পদ্ধতিগত ত্রুটি দেখিয়ে বাতিল করে দিয়েছিলেন। সুপ্রীমকোর্টের পাঁচজন বিচারপতির মাঝে শুধু বিচারপতি এ র কর্নেলিয়াস (পরে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি) বিচারপতি মুনির গং-এর রায়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন। তিনি রায়ের প্রত্যেকটা বক্তব্যকে খণ্ডন করেছিলেন যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে। এই মামলার এই রায় ছিল পাকিস্তানে গণতন্ত্র হত্যা করার বীজ বপনের মতো। বিচারপতি মুনির যদি সিন্ধু প্রদেশের রায়কে বহাল রাখতেন তাহলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ইতিহাস অন্যভাবে প্রবাহিত হতো। এই দীর্ঘ সময় পরও বিচারপতি মুনিরের এই রায় পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা মানুষকে চরমভাবে বিচলিত করে এবং তারা একজন বাঙালী মৌলভী তমিজউদ্দিন খানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। পাকিস্তানের একাধিক শহরে মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের নামে সড়কের নামকরণ করা হয়েছে।

পরবর্তীকালে আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে সংবিধান স্থগিত করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করলে পরে তার বিরুদ্ধেও মামলায় হয়। তবে তা হয় তাদের ক্ষমতাচ্যুতির পর। আদালত তাদের ক্ষমতা গ্রহণকে সাংবিধানিকভাবে অবৈধ ঘোষণা করে। আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের বিরুদ্ধে মামলায় বিচারপতি ইয়াকুব আলী খান মৌলভী তমিজউদ্দিন খানের মামলার উদ্ধৃতি দেন এবং বলেন, আইয়ুব খান ও ইসকান্দার মির্জা ১৯৫৬ সালে সংবিধান বাতিল করে দেশদ্রোহিতার (Treason) কাজ করেছেন। এটি তাদের কাজ ছিল না। ভুট্টোকে হটিয়ে যখন জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতা দখল করে তখনও অনুরূপভাবে মামলা হয়। উচ্চ আদালতের নয়জন বিচারপতি মামলাটি শোনেন। রায়ে বলেন, যদিও

ক্ষমতা দখল একটি আইন বহির্ভূত কাজ তথাপি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এবং জনস্বার্থে সামরিক আইন জারিকে বৈধতা দেয়া হলো। সুতরাং পাকিস্তানের বিচারকরা যে সব সময় তাদের নিজ দেশের সংবিধান অথবা আইনের প্রতি সমান ভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিল তা বলা যাবে না। গোড়াতে যদি বিচারপতি মুনির আইনের দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্তটি দিতে পারতেন তাহলে এই কথাটি লিখতে হতো না।

বাংলাদেশেও পাকিস্তানের মতো কখনও কখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ৫ নবেম্বর ১৯৭৫ সালে যখন রাষ্ট্রপতি পদ থেকে খোন্দকার মুশতাক উৎখাত হন তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসাবে দেশের প্রধান বিচারপতি এএসএম সায়েম নিযুক্তি লাভ করেন। সাত নবেম্বর যখন জেনারেল জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তখনও বিচারপতি সায়েম রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার প্রতি আনুগত্য বজায় রাখেন। পরে অবশ্য বিচারপতি সায়েমকেই আবার প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। যদিও রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে বিচারপতি সায়েম আসীন আসল ক্ষমতা জেনারেল জিয়ার হাতেই এবং তা বিচারপতি সায়েম বিনাবাক্যে মেনে নিয়ে সাক্ষীগোপাল হয়ে বঙ্গভবনের চার দেয়ালের মধ্যে জীবনযাপন করছিলেন। এক বছরের মাথায় ২৯ নবেম্বর ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়া রাষ্ট্রপতি সায়েমের কাছ হতে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বটা নিজে নিয়ে নেন। ১৯৭৭ সালে সায়েম তার পদ হতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং জিয়া দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। বিচারপতি সায়েম কখনও মেরুদণ্ড সোজা করে জিয়ার এতসব অসাংবিধানিক ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রাষ্ট্রপতির মোহ ছেড়ে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করতে পারেননি।

১৯৮১ সালে ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে জেনারেল জিয়া নিহত হলে উপরাষ্ট্রপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৮২ সালে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সংবিধান স্থগিত করা হয়। ২৭ মার্চ তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এএফএম আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। আবারও বিচারপতি। আবারও অসাংবিধানিক ভাবে ক্ষমতা প্রহণকে সমর্থন।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর হতে পালাক্রমে খোন্দকার মোশতাক ও জেনারেল জিয়া সামরিক আইনের ছত্রছায়ায় অনেক অসাংবিধানিক ও মানবতাবিরোধী অধ্যাদেশ জারি করেন (১৫ আগস্ট ১৯৭৫- ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ সময় কাল)। পরবর্তী কালে এই সকল অধ্যাদেশ পঞ্চম সংশোধনীর ছত্রছায়ায় জেনারেল জিয়া সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধানকে অপবিত্র করেন। পঞ্চম সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির মধ্যে ছিল বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার সাথে জড়িত সকলকে বিচারের আওতায় আনা হতে অব্যাহতি দান (Indemnity Act) সামরিক আইনের বৈধতা দান ইত্যাদি।

বাংলাদেশের উচ্চতর আদালতে ২০০৫ সালের আগস্টে অন্য আর একটি মামলার (ঢাকার মুন সিনেমার মালিকানা বিষয়ক) রায় দিতে গিয়ে বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান কতৃক ঘোষিত সামরিক আইন ও পঞ্চম সংশোধনী বিষয়ক এক যুগান্তকারী রায় দেয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক তাঁর ২৪২ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন ও রায়ে পঞ্চম সংশোধনীকে অসাংবিধানিক ও অকার্যকর আখ্যায়িত করে ও সংশোধনের অন্তর্ভুক্ত সকল অধ্যাদেশকে বাতির করে দেন। একই সাথে সামরিক আইন জারির মাধ্যমে খোন্দকার মোশতাক আহমদ, বিচারপতি এএসএম সায়েম এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকে অসাংবিধানিক আখ্যায়িত করেন। তবে কিছু কিছু সংশোধিত সাংবিধানিক ধারা যা সম্পূর্ণ বাতিল করে দিলে সাংবিধানিক শূন্যতা দেখা দিতে পারে এবং দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে (যেমন সংবিধানের সংশোধিত ৯৫ ধারা)। তার কার্যকারিতা বহাল রাখার পক্ষে রায়ে উল্লেখ থাকে। তবে রায় প্রদানের পর সেদিন গভীর রাতে জোট সরকারের পক্ষে এ্যাটর্নি জেনারেল রায়ের বিরুদ্ধে একটি আপীল দায়ের করেন এবং মহামান্য আদালত আপীল মঞ্জুর করে হাইকোর্টের রায়কে স্থগিত করে।

মহাজোট ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯ সালের ৪ মে সরকারের পক্ষে পূর্বে দায়েরকৃত পঞ্চম সংশোধনী বাতিলের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হয়েছিল তা প্রত্যাহারের আবেদন করেন বর্তমান এ্যাটর্নি জেনারেল। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা এই আপীল মামলা আর পরিচালনা করবে না অর্থাৎ তারা হাইকোর্টে দেয়া রায়কে মেনে নেবে। বোধগম্য কারণেই বিএনপি তা সহজে মেনে নেবে না এবং যথারীতি দলের মহাসচিব খোন্দকার দেলওয়ার হোসেন সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অন্য আরও দুস্বজনের সাথে একটি আপীল দায়ের করেন। শেষ পর্যন্ত এই বিষয়ে কি হয় তা বিবেচনা করার ভার মহামান্য আদালতের ওপর। পাকিস্তান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত ইতিহাসের পক্ষে এবং বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বাংলাদেশে আগামীতে কি হবে তা আগাম বলা মুশকিল। তবে ইদানীং কালে বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের অনেক সিদ্ধান্ত আদালতের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। দেশের মানুষের আস্থার শেষ ভরসাস্থল দেশের উচ্চতর আদালত। তা যদি কোন কারণে নষ্ট হয় তা হলে রাষ্ট্রের ভিতই দুর্বল হয়ে পড়ে। আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি মুনির ইতিহাসের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটিকে যে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিলেন সেই রাষ্ট্রটি এখনও আলোর সন্ধান করছে।

সব শেষে পাকিস্তানে ও আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত রিচার্ড হলব্রুকের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে লেখার সমাপ্তি টানতে চাই। বিচারপতি ইফতেখার চৌধুরীর দেয়া রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রিচার্ড হলব্রুকের কাছে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেন, ইতিহাস এবং যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে (পারভেজ মোশারফ) উদ্ধার করতে আসবে না। সেই পুরনো প্রবাদের আবার নতুন করে ফিরে আসা। যুক্তরাষ্ট্র কারও বন্ধু হলে তার শত্রুর প্রয়োজন পড়ে না।

লেখক : শিক্ষাবিদ

মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় এমআর আখতার মুকুলের নাম আছে কি?

শামীম মমতাজ

সত্যি পাঠক কী বিচিত্র এই দেশ! মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় এমআর আখতার মুকুল চরমপত্রের নাম আছে কি? চমকে উঠলেন? আমিও সেই মুহূর্তে বিস্ময়ে বোবা হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলাম। না আজকের কথা নয়, যখনকার কাহিনী তখনও এমআর আখতার মুকুল বেঁচে ছিলেন– তাঁর মৃত্যুর দশ দিন আগের ঘটনা দু'হাজার চার সালের জুন মাসে জোট সরকারের আমলের সেই কথা ও কাহিনী খুলে বলার সময় আজ এসেছে।

তখন প্রায় বারো-তেরোদিন ধরেই আমার ভাই এমআর আখতার মুকুল বারডেমে খুব বেশি অসুস্থ। প্রতিদিনই তাঁর শারীরিক অবস্থা অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। আমরাও হাসপাতালে তাঁর পাশে থাকার সময় বাড়িয়ে চলছি। প্রায় কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন এমনি সময়ে এক রাতে সকলে চলে গেলে মুকুল ভাই ইশারা করে আমাকে সংক্ষেপে যা বললেন তা হলো

ওনার ব্যাংক একাউন্টে ছাব্বিশ হাজার টাকা জমা আছে। সেটা তুলে আমরা যেন মীরপুর কবরস্থানে ওনার শেষ বিশ্রামের জায়গা কিনে ফেলি। বাসায় ফিরেই আমরা স্থির করি যেভাবেই হোক এই জোট সরকারের কাছেই বুদ্ধিজীবী কবরস্থানের সাড়ে তিন হাত জমি মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী এমআর আখতার মুকুলের জন্য বরাদ্দ নেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবকে টেলিফোনে পেতেই বেশ কিছু সময় চলে গেল। ইতোমধ্যে প্রায় প্রতিদিনই দৈনিক খবরের কাগজে এবং টেলিভিশনে এমআর আখতার মুকুলের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতির কথা প্রকাশ পেতে থাকে। আমি আমার পারিবারিক পরিচয় দিয়ে মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মুকুল ভাইয়ের শেষ বিশ্রামের জন্য এক টুকরো জায়গার আবেদন করলাম। উত্তরে সচিব যা বললেন আজ পাঁচ বছর পরে তা প্রকাশ করার জন্য আমাকে কলম ধরতে হলো। তিনি বললেন, "দেখুন এ সরকার ক্ষমতায় এসে একটি নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট তৈরি করেছে, উনি কি মুক্তিযোদ্ধা? যদি মুক্তিযোদ্ধা হন তাহলে তাঁর নাম এই তালিকায় আমাকে খুঁজে দেখতে হবে। না থাকলে আমাদের করণীয় কিছুই নেই–একটু অপেক্ষা করুন।"

হ্যাঁ অপেক্ষা করতে হলো আমাকে। আজ সুর্দীঘ পাঁচ বছর ধরে আমি ধৈর্য ধরে আছি। প্রতিটি জুন মাসের ছাব্বিশ তারিখে এমআর আখতার মুকুলের মৃত্যুবার্ষিকী এলেই আমার মনে পড়ে যায় আর ভাবি, এবারে এই অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর স্মরণীয় ঘটনার কথা জানাব দেশবাসীকে। কিন্তু না –এই বিভীষিকাময় কষ্টের দুঃসহ স্মৃতিটি আমাকে তাড়িয়ে বেড়াল দীর্ঘ চারটি বছর। অনেক দুঃখে আমি তা আমার হৃদয়ের অতি গভীরে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলাম। কারণ বিশ্বাস ছিল এমনদিন নিশ্চয়ই আসবে যেদিন আমার মনের মস্ত বড় বোঝাটি আমি আমার বাংলার মানুষকে জানাতে পারব, তারাও আমার সেই মহাকষ্টের অংশীদার হবেন। অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা, পার করে এল দু'হাজার আটের উনত্রিশে ডিসেম্বর। এল নিরপেক্ষ নির্বাচন। নতুন আলোয় বিজয়ের আনন্দে চারিদিক গণতন্ত্র আজ এসেছে–দিনবদলের পালা শুরু। সবার সঙ্গে 'নাই ভয় নাই হবে হবে জয়' কণ্ঠে ধারণ করে এতদিনের চাপা দুঃখ-কষ্ট, ক্ষোভে কলম নিয়ে প্রকাশ করতে বসলাম ২০০৪ সালের জুন মাসের সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহ, ভয়ানক, ভীষণ কঠিন উক্তিটি। "সরকার একটি নতুন মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট তৈরি করেছে, উনি কি মুক্তিযোদ্ধা? তার নাম তালিকায় খুঁজে দেখতে হবে"।

কত বড় দুঃসাহস থাকলে (চরমপত্রের জাদুঘর) এমআর আখতার মুকুলের নাম মুক্তিযুদ্ধের তালিকায় তারা খুঁজে দেখতে চায়? কত স্পর্ধা বুকে নিয়ে সে সময়ের মুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কর্তা ব্যক্তিটি এ কথা বলতে পারে? মুক্তিযুদ্ধ তারা কি চোখে দেখেনি? মুক্তিযুদ্ধ কী তা জানে না? নয় মাস তবে তারা কোথায় ছিল নিশ্চয়ই এ বাংলার মাটিতে, কবে?

এবারে একটু ফিরে যাই ২০০৪ সালের জুন মাসের সেই কালো দিনগুলোতে। অতি ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ কথাটি কানে নিয়ে নীরবে গিয়ে দাঁড়ালাম বারডেমের আইসিইউতে আমার ভাইয়ের শয্যাপাশে। অনেক ডাক্তার ও নার্সের ভিড়ে তাকিয়ে দেখি সারা শরীরে সুঁই আর তারে আবৃত দেহ, নাকে অক্সিজেন মাস্ক এবং হাতে স্যালাইন ও রক্ত ইত্যাদির মাঝে আমার চিরযোদ্ধা ভাইটিকে দেখে অসহ্য মানে হলো। একাত্তরের রণাঙ্গনের সেই ৃভণুটভ ইরবহ প্রতিদিনের এ্যাটম বোম চরমপত্রের রূপকার আজ কত অসহায়! মনে হলো চরমপত্রের নায়ক ছক্কুমিয়া, নিজেই আজ এক জীবনযুদ্ধে রণক্লান্ত যোদ্ধা। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে রাগে ক্ষোভে দুঃখে জর্জরিত ওনার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হলো এমন বৈরী সময়ে জঙ্গীবাদী, সুযোগবাদী, সুবিধাবাদী সরকারের দৃষ্টি এখন এমআর আখতারের দিকে। এদের বন্দীখানায় তারা 'চরমপত্রের' সেই 'বাঘে খাওয়া পোলারে' বন্দী করতে চায়। মুক্তিযুদ্ধের রক্তে স্নাত বাংলায় এখন স্বাধীনতাবিরোধীদের এই ঘৃণিত দৃশ্য চোখে দেখে বড় দুঃখ ও অসীম যন্ত্রণা আর ক্ষোভ নিয়ে মুকুল ভাই নিজের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছেন। সেই যুদ্ধে ক্ষয়ে ক্ষয়ে বিপন্ন হলো তাঁর জীবনীশক্তি। তাই তো দুর্বার অপ্রতিরোধ্য সৈনিক এমআর আখতার মুকুলের শেষ শয্যায় তাঁর চোখে ছিল অশ্রু। এই অশ্রুর মূল্য দিতে আবার এক মুক্তিযুদেধর বাঙালীকে জাগাতে হবে, তাই বলে উঠলাম, "চোখ মেলে জাগো মুকুল ভাই, এই চরম মুহূর্তে আর এক চরম যুদ্ধের জন্য আবারও তোমাকে হাতে নিতে হবে অস্ত্র, ঘুমন্ত বাঙালীকে আবারও তোমার বজ্রকণ্ঠ বলে উঠবে 'ঐ', ঐ যে মোছ্লায়াগুলান পালায় যায়ম তাদের লগে ঠ্যাটা মালেক্যাও পালায়। ধর ধর তাগোরে ধর। একটা একটা করে তাদের গোস্ত দিয়া কাবাব বানান লাগব। মুক্তি ভাইরা হুঁশিয়ার এ দেশ আমাগোর, এদেশ বাঙালীর, এদেশ আমার মায়ের দেশ। কোনও ছাড় দেয়া চলব না।" সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে লাগল। দৈনিক খবরে এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় তাঁর অসুস্থতার খবর যতই প্রচারিত হতে লাগল ততই বারডেমের আইসিইউ'র ভেতরে, বাইরে ও করিডোরে দর্শনার্থীর ভিড় বাড়তে লাগল। শেখ হাসিনা, নানা সংগঠনের নেতা, গণ্যমান্য লেখক, কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সহযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তি ও অগণিত মুকুল প্রেমিকের পদচারণায় বারডেম যখন সরব হয়ে উঠেছে তখন মনের কোণে আশা– দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী হয়ত এই মহান স্বাধীনতার বীর সৈনিককে হাসপাতালে তাঁর অন্তিম সময়ে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য একবার আসবেন। কিন্তু না, এদেশেটা যাঁরা স্বাধীন করে গেলেন তাঁদের প্রতি শেষ সম্মানটুকু দেখাবার ইচ্ছা কোন মহারথীর হয়নি। হয়ত এ জন্য জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, "যে দেশে জ্ঞানীগুণীর কদর নেই সেদেশে প্রতিভাশালীর জন্ম হয় না।"

তবে সাধারণ মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হয়েছেন শব্দযোদ্ধা আজীবন আপোসহীন লেখক এমআর আখতার মুকুল। তাঁর মৃত্যুর দুদিন আগে সন্ধ্যায় একজন হুইল চেয়ারে বসা ও সঙ্গে আরও কয়েকজন সুদূর যশোর থেকে চরমপত্রের মুকুলকে দেখতে আসলেন। পরিচয়ে জানলাম হুইল চেয়ারে বসা ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন কমান্ডার ও বাকিরা মুক্তিযোদ্ধা। খবরের কাগজে সংবাদ দেখে তাঁরা নিজ চোখে চরমপত্রকে দেখতে এবং শ্রদ্ধা জানাতে এতদূর পথ এসেছেন। কর্তব্যরত নার্স ও চিকিৎসকদের অনুমতি নিয়ে তাদের আইসিইউতে আনা হলো। তখন ঘটে গেল যেন চরমপত্রের শেষ দৃশ্য যা এমআর আখতার নিজেও রচনা করেননি। তাঁরা প্রবেশ করেই ওনার পায়ে সালাম করলেন এরপর সকলে মিলে স্যালুট করলেন। কয়েকটি মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে অশ্রু ভেজা কণ্ঠে বলতে লাগলেন একাত্তরের নয় মাসের চরমপত্রের কথা ও কাহিনী। যে বীরকণ্ঠে আপ্লুত হয়ে একদিন তাঁরা হাসিমুখে জীবনবাজি রেখে অস্ত্র ধরেছিলেন, আজকে সেই সেনাপতির অবস্থা দেখে কেউ আর চুপ থাকতে পারলেন না। তাকিয়ে দেখি কর্তব্যরত নার্সটিও গোপনে চোখ মুছলেন। এই তো আপামর দেশবাসীর কাছ থেকে স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র প্রচারিত অবিস্মরণীয় কথিকা ও স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল 'চরমপত্রের' লেখক ও কথক এবং প্রবীন সাংবাদিক এমআর আখতার মুকুলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পরম পাওয়া। প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির কাছে চরমপত্রের মুকুলের কোন মূল্য না থাকুক, দেশবাসী তাঁকে সহস্র ব্যঞ্জনায় শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে। মারহাবা মুকুল ভাই।

পুরো রাত নির্ঘুম কাটিয়ে খুব ভোরেই ছুটে গেলাম বেইলীরোডে ভাইয়ের বাসায়। চুপচাপ শান্ত বেইলীরোডকে সেদিন কেমন যেন অচেনা লাগল। বেলা বাড়লে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত, গুণগ্রাহী ও নানামানুষের আনাগোনায় তাদের আহাজারি কান্না ও চিৎকারে চারিদিকের বাতাস ভারি হয়ে উঠল। প্রথম জানাযা শেষে আমার ভাই প্রিয়জনদের কঠিন মায়া ছেড়ে চলে গেলেন শেষ যাত্রায়। পেছনে তাকিয়ে দেখি ট্রাকভরা শুধুই ফুল আর ফুলের মালা। প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশে ফুলের ছোট্ট স্তবক না এলেও আমাদের কোন আফসোস থাকল না। চতুর্থ জানাযা শেষ হলে সারাবাংলার ভালবাসায় পূর্ণ হয়ে এমআর আখতার মুকুলের শেষ ঠিকানা হলো মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে। মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

এই সাড়ে তিন হাত মাটির জন্য একাত্তরের বীর মুক্তিযোদ্ধা এমআর আখতার মুকুলকে স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর পরে বাজাকার পরিবেষ্টিত জোট সরকারের আমলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তিনি সত্যি একজন মুক্তিযোদ্ধা।
বাঙালী জাতির দূর্ভাগ্য এই, যে সময়ে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকারদের গাড়িতে জাতীয় পতাকা ওড়ে, সে সময়ে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে শেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে তাঁর কফিন বাংলাদেশের পতাকায় আবৃত করতে অনেক কাঠখড়ি পোড়াতে হয়েছে।
গত পাঁচ বছরে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার বুকে নানা পানির স্রোত এসে মিশেছে। গত আঠারই মে সোমবারের 'দৈনিক জনকণ্ঠের' একটি খবরে আমি বিস্মিত, চমকিত ও অবাক না হয়ে পারিনি। সম্প্রতি 'দৈনিক আমার দেশ' আয়োজিত 'জাতীয় নিরাপত্তার আলোকে সংবাদপত্রের দায়বদ্ধতা' শীর্ষক আলোচনায় ড. মাহবুবউল্লাহ বলেন, "ভারতের চাপের মুখে মুক্তিযুদ্ধের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়েছে। স্বাধীনতার ভাবনায় রাষ্ট্র বাংলাদেশ হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জন হয়নি –এর মূল কারণ নেতৃত্বের দুর্বলতা ও ভারতের চাপ। সব মিলিয়ে যোগ্য অবস্থানে পৌঁছাতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধ। অন্যদেশের সৈনিক সশরীরে হাজির হলে মুক্তিযদ্ধের মৌলিকত্ব থাকে না। আমরা ভারতের কাছে স্বাধীনতার সময় জিম্মি ছিলাম ইত্যাদি।"
তাই আজ যখন জাতি হাবুডুবুর মাঝে অন্ধকার পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছে তখনই এমআর আখতার মুকুলের সবল, সফল সাহসী লেখনীর ভীষণ প্রয়োজন ছিল। তাই তো লুৎফর রহমান রিটনের ছড়ায় আমরা দেখতে পাই:
দেখিছিল বিজয় তুই
তোর জন্য গোলাপজুঁই
কোথায় গেলি, আনেকদূর?
আবার ডাকে একাত্তর
ঘাতকগুলো তুলছে ফনা অথচ তোর দেখা নেই
আজ কতোদিন পত্রিকাতে তোর তো কোন লেখা নেই।
আয়রে মুকুল ঘরে আয়
শকুনগুলো করছে সভা তোর বাড়ির ঐ আঙ্গিনায়।
ডডই থমমঢ়মফঢধণর ভণশণর ঢধণ্র'-মুকুল ভাইয়ের মতো গুড সোলজার তো বর্তমান বাংলার মাটিতে প্রতিদিন জন্মায় না। মুকুল ভাই তোমার সঙ্গে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষও একাত্তরে বিজয় দেখেছিল। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, সে বিজয় এখন আমাদের সবার কাছে এক সোনার হরিণ। তুমি মরে গিয়ে বেঁচেছো, আর আমরা বেঁচে থেকেই মরছি।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ॥ বাংলাদেশের বিপন্ন আদিবাসী

শাহরিয়ার কবির

১৯৯৪-এর ২৩ ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে(প্রতি বছর ৯ আগস্ট 'বিশ্বের আদিবাসীদের আন্তর্জাতিক দিবস' (International Day of the World's Indigenous People) হিসেবে পালিত হবে। বাংলায় আমরা সংক্ষেপে বলি 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস'। বিভিন্ন দেশে আদিবাসীরা সংস্কৃতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন সহ মানবাধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে, এই বঞ্চনা কীভাবে দূর করা যেতে পারে, লুপ্তপ্রায় আদিবাসীদের অস্তিত্ব কীভাবে রক্ষা করা যেতে পারে, এ সব বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহৃপ্রদায়ের করণীয় নির্ধারণের জন্যেই জাতিসঙ্ঘের এই উদ্যোগ। আদিবাসীদের প্রতি জাতিসংঘের দায়বদ্ধতা থেকে এরপর সাধারণ পরিষদে ২০০৭-এর ১৩ সেপ্টেম্বর গৃহীত হয়েছে 'আদিবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা।' (Declaration on the Rights of Indigenous people) আদিবাসীদের অবস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। যে সব অঞ্চল মানব সভ্যতার উৎপত্তিস্থল হিসেবে বিবেচিত সেসব অঞ্চলে আদিবাসীদের সংখ্যা বেশি। এই আদিবাসীদের স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচয় রয়েছে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও স্বতন্ত্র। আধুনিক সভ্যতার বিকাশ, শক্তিশালী জাতির সাম্রাজ্যলিঞা ও জাত্যাভিমান আদিবাসীদের অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিপন্ন করে তুলছে। ইউনেস্কোর হিসেবে বর্তমানে পৃথিবীতে পাঁচ হাজারেরও বেশি ভাষার অস্তিত্ব বিপন্ন। যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডেভিড হ্যারিসনের মতে প্রতি দুই সপ্তাহে পৃথিবী থেকে একটি ভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। 'প্রাভদা'য় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, আগামী একশ বছরে পৃথিবী থেকে অন্ততপক্ষে দুই হাজার ভাষা হারিয়ে যাবে। (প্রাভদা, ৬ আগস্ট ২০০৯) বর্তমানে পৃথিবীর ভাষার সংখ্যা সাত হাজার। এর ভেতর সাড়ে তিন হাজার ভাষায় কথা বলে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র দুই ভাগ মানুষ। একটি ভাষার মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে সেই নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিলুপ্তিকরণ, যা মানব সভ্যতার জন্য এক বেদনাবহ অভিজ্ঞতা।প্রতি বছর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপনকালে আমরা যখন বাংলাদেশের মানচিত্রের দিকে তাকাই স্বস্তিদায়ক কিংবা আশাব্যঞ্জক ঘটনা খুব কমই নজরে পড়ে। ১৯৪৭ সালে সাহৃপ্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যখন পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তখন থেকে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেয়া, সামরিক-আধাসামরিক বা অসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা নির্যাতন, হত্যা এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-ব্যবসা-চাকরিতে বঞ্চনা, অবকাঠামো উন্নয়নে বৈষম্য, ধর্মপালন ও সংস্কৃতিচর্চায় বিঘ্নসৃষ্টি প্রভৃতি প্রাত্যহিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের '৭২-এর সংবিধানকে গণ্য করা হয় বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান হিসেবে। শতকরা ৮৫ ভাগ জনসংখ্যা মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে(যা নিঃসন্দেহে সংখালঘু ধর্মীয় ও এথনিক সহৃপ্রদায়ের জন্য স্বস্তিদায়ক(যদিও এই সংবিধানে আদিবাসীর স্বতন্ত্র জাতিসত্তার কোনও স্বীকৃতি এবং বিশেষ মর্যাদার কোন বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে(দুই উর্দিপরা জেনারেলের জমানায় ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে '৭২-এর সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা মুছে ফেলে উপরে 'বিসমিল্লাহ ....' এবং মুখবন্ধে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস' স্থাপন এটিকে একটি সাহৃপ্রদায়িক সংবিধানে রূপান্তরিত করেছে। ৮ম সংশোধনী জারি করে যখন ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে ঢোকানো হয় তখন থেকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ধর্মীয় ও আদিবাসী সহৃপ্রদায়ের সদস্যরা কার্যতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে রূপান্তরিত হয়েছে।রাষ্ট্রের এই নির্যাতন, বঞ্চনা ও আগ্রাসন বাংলাদেশের আদিবাসীদের অস্তিত্ব ক্রমশঃ বিপন্ন করে তুলছে। ১৯৭১-এর আদমশুমারি থেকে আমরা জানতে পারি বাংলাদেশে ৪৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অবস্থান রয়েছে পাহাড় ও সমতলে, যাদের ভাষার সংখ্যা ৩২। গত আটত্রিশ বছরে বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে দশটি নৃ-গোষ্ঠী হারিয়ে গেছে, বিলুপ্ত হয়েছে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও ইতিহাস। আদিবাসীদের প্রতি রাষ্ট্রের বৈরি মনোভাব পরিবর্তিত না হলে একশ বছর পর বাংলাদেশে আদিবাসী পরিচয়ের কারও অস্তিত্ব থাকবে না।

(চলবে)